ভাঙনের পূর্বপ্রস্তুতি

আব্দুর রহমান আল হাসান

দুটি কথা

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। যিনি জীবন দান করেন আবার মৃত্যুদান করেন। যিনি বান্দাকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান এবং শাস্তি প্রদান করেন। আমরা তার নিকটই ফিরে যাব। কালিমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করে আমরা মুসলিম হওয়ার পর শরীয়াহ আমাদেরকে কিছু দায়িত্ব দেয়। যেটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব হলো, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ। সূরা আলে ইমরানে এই ব্যক্তিদেরকে ‘সর্বোত্তম জাতি’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সংকলনটি তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজের ফায়দার জন্য। বিভিন্ন বিষয়ে পড়ার পর নিজে আবার উক্ত বিষয়ে কলম তুলে ধরি। যাতে অন্তরে বিষয়টা পরিপূর্ণভাবে বসে যায়। এই ক্ষুদ্র সংকলনটি কারো উপকারে আসলে এটি ‘স্বার্থক’ মনে করবো। আল্লাহ তা’আলা এটিকে কবুল করে নিন। এর মধ্যে যত ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে। যত ভালো জিনিস রয়েছে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে।

আমরা মুসলিম। এটাই আমাদের একমাত্র পরিচয়। মুসলিম পরিচয়ের উপর আমাদের আর কোনো পরিচয় নেই। আমাদের মাকসাদ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা। আল্লাহ তাওফিক দান করুন। আমীন্

আব্দুর রহমান আল হাসান
www.arhasan.com
info@arhasan.com

সূচিপত্র

ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব ও মতাদর্শের সংঘর্ষ

ইহুদিদের উত্থান	৯
রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ	১৫
সভ্যতার দ্বন্দ্ব	১৮
ধর্মনিরপেক্ষতার মুখস্ত বুলি	২১
সেক্যুলারিজমের ধর্মীয় স্বাধীনতা	২৬
গণতন্ত্রের চোর পুলিশ খেলা	৩০
ইসলামী গণতন্ত্রের স্বরূপ সন্ধানে	৩৪
গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও বিপ্লব	৪০
মত প্রকাশের স্বাধীনতা কোথায়?	৪৭
ধর্ম যার যার উৎসব সবার কথাটি কি আদৌ যুক্তিসঙ্গত?	৪৯
আমরা শিক্ষাব্যবস্থায় কাদের অনুসরণ করি?	৫১

উম্মাহর সন্ধিক্ষণ

ঘুমন্ত উম্মাহ ও জাগ্রত শত্রু	৫৫
মুসলমানদের বড় শত্রু কারা?	৬০

এই ভূখন্ডে আমাদের ভবিষ্যত কি?	৬৪
হাসিনার পদত্যাগের পরবর্তী বাংলাদেশ	৭৫
বাংলাদেশে দ্রোহের ব্যর্থতা	৮২
বাংলাদেশে জাতিসংঘের অফিস এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৮৪
ভারতে ওয়াকফ সম্পত্তি দখল ও তার প্রভাব	৮৭
যাকাত আদায়ের কারণেও বন্দী হচ্ছে উইঘুররা	৯১
চীনের জিনজিয়াংয়ের কাজাখ পরিবারগুলোর দুঃখ	৯৫
ফিলিস্তিনের ভূমিপুত্র কারা?	১০৫
ফিলিস্তিন যেভাবে স্বাধীন হবে	১১১

ফিতনার মুখোমুখি উম্মাহ

ট্রান্সজেন্ডার কি?	১২০
ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনে দুর্বল কারা?	১২৪
বাংলাদেশে সমকামিতা মতাদর্শ বিস্তার	১২৭
ট্রান্সজেন্ডার ধর্মীয়ভাবে কতটুকু সমর্থিত?	১৩৯
স্বাধীনতার উল্টো পিঠ	১৪৮
ইসলামের দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ পরীক্ষা	১৫১
বোরকার ফাঁদ	১৫৫
বোরকা কি ফ্যাশন নাকি শরীয়াহ নির্দেশিত পোশাক?	১৫৮
ফেমিনিজম বা নারীবাদ	১৬১

নারীবাদী তত্ত্ব থেকে নাস্তিক ১৬৭

নারী নেতৃত্ব ১৭২

শিয়া মতবাদ ও আকীদাগত বিচ্যুতি ১৭৮

সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্ধকার দিক

আসিফা বানু থেকে মৌমিতা ১৮৮

অ্যাপল যেভাবে ইসরাইলকে সমর্থন করছে ১৯৪

কোকাকোলা কেন বয়কট করা উচিৎ ১৯৯

যুদ্ধনীতির ক্রমবিকাশ ২০৪

আল ইয়াসিন ১০৫ মর্টার শেলের পেছনের গল্প ২১২

সামরিক বাহিনীর প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধার কারণ ও বাস্তবতা ২১৭

প্রথম আলোর অন্ধকার দিক ২২০

ক্রমবর্ধমান মুসলিম বিদ্বেষ, আড়ালে কারা? ২২৪

আমেরিকার চোখে মুসলমানদের পার্থক্য ২২৮

শাহবাগ বাইনারি ২৩১

শাহবাগী বনাম শাহবাগ বিরোধী সেক্যুলার ২৩৫

বুনো উল্লাসে নতুন বছরের বার্তা ২৩৭

বড়দিনের আসল ইতিহাস বনাম বাস্তবতা ২৩৯

পরিবার ভাবনা ২৪৪

মরণের বাস্তবতা ২৪৮

ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব ও মতাদর্শের সংঘর্ষ

ইহুদিদের উত্থান

পৃথিবীতে হঠাৎ করেই ইহুদীদের উত্থান ঘটে নি। গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে আছে এর মধ্যে। ইউসুফ আ. এর মৃত্যুর পর থেকে মিসরেই ইয়াকুব আ. এর ১২ ছেলের বারোটি গোত্র অবস্থান করছিল। একটা সময় মিসরের শাসন ব্যবস্থা থেকে বনী ইসরাইলের পতন ঘটে। শাসনব্যবস্থা চলে যায় কিবতি কাফিরদের হাতে। শুরু হয় বনী ইসরাইলের উপর নির্যাতনের খড়গ। এমনবস্থায় হযরত মুসা আ. এর আগমন ঘটে।

মুসা আ. এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুদরতীভাবে ইহুদীদেরকে মিসরের ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি দিলেন। এরপর ইহুদীদেরকে বলা হলো, তোমরা (ফিলিস্তিন) ভূমিতে প্রবেশ করো এবং সেখানে আল্লাহর কুদরত অনুসন্ধান করো। কিন্তু তারা সেখানে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ, সেটি ছিল যোদ্ধাদের এলাকা। শাস্তিস্বরুপ আল্লাহ তা'আলা ৪০ বছর ইহুদীদেরকে 'তীহ প্রান্তরে' যাযাবর বানিয়ে রাখলেন।

ফিরআউনের পর আরো বিভিন্ন সময়ে ইহুদীরা নির্যাতিত হয়েছে। কখনো বুখতে নসরের হাতে, কখনো জালুতের হাতে। তাই তাদের নিকট নির্যাতন-নিপীড়ন নতুন নয়। বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্য কোনো জাতি ইহুদীদের মতো এতটা নির্যাতনের শিকার হয় নি। বেশিরভাগ সময়ে ইহুদীরা নিজেরাই নিজেদের জন্য খাল কেঁটে কুমির

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

ইতিহাসের বিখ্যাত রোমান সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ছিল হাজার বছরের বেশি সময় ধরে। কিন্তু এরপরও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে নি এই সাম্রাজ্য। হযরত ঈসা আ. পৃথিবী ছেড়ে মহান আল্লাহর নিকট চলে যাওয়ার পর থেকে সেন্ট পলের হাত ধরে খৃস্টধর্মের প্রচার-প্রচারণা বাড়তে থাকে। এর পাশপাশি ইহুদিদের সাথে সংঘাত, বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর সাথে সংঘাত তো ছিলই। তাই খৃস্টধর্মের পণ্ডিতরা নিজেদের প্রয়োজন ও সুবিধার্থে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নীতি ধর্মে যুক্ত করে ও রহিত করে।

এর ফলে একটা সময় দেখা যায়, এই ধর্ম বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। সেন্ট পল আসার আগে খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে নীতি-আদর্শ ছিল। কেননা তখন ছিল এটি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত একটি শরীয়াহ। যা মুসা আ. এর দ্বীনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সেন্ট পল এসে শরীয়াহকে বাদ দিয়ে নিজস্ব চিন্তাধারা ধর্মের মধ্যে যুক্ত করা শুরু করে। খৃস্টধর্মের আড়ালে প্রচার হতে লাগলো পৌত্তলিক চিন্তাধারা। ধর্ম থেকে ১৮০ ডিগ্রি উল্টো দিকে গিয়ে আদেশ-নিষেধ প্রদান করা শুরু করলো এর ধর্মগুরুরা। ৪র্থ খৃস্টীয় শতাব্দীতেই খৃস্টধর্ম একটি মিশ্রিত ধর্মে পরিণত হয়।। এর মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবেশ করে গ্রিক পৌরাণিক কাহিনী, রোমান পৌত্তলিকতা, মিসরীয় নব্য-প্লেটোবাদ ও বৈরাগ্যবাদ।

রোমান সাম্রাজ্য একটা সময় খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলেও তা ছিল পৌত্তলিকতার আদলে মিশ্রিত একটি ধর্ম। আস্তে আস্তে এর ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যেও আসতে থাকে জটিলতা। মানুষ তখন ধর্ম নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতো এবং এমন এমন মতানৈক্য সামনে আনতো যা ছিল অপ্রয়োজনীয়, অপরিপক্ক। একটা সময় ধর্মীয় এসব বিবাদ যুদ্ধ ও

সভ্যতার দ্বন্দ্ব

এনলাইটেনমেন্টের পর বিশ্ব প্রতিনিয়্যত বদলেছে। ধর্মীয় কাঠামোকে পরিবর্তন করে নতুন রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বদলেছে পরিভাষার মারপ্যাচ, উপসংহারের চিরায়ত তত্ত্ব। তাওহীদ বনাম শিরক, ঈমান বনাম কুফর, ইসলাম বনাম জাহিলিয়্যাত – এগুলোই হলো মানব ইতিহাসের প্রধানতম দ্বন্দ্ব। প্রত্যেক নবী এই দ্বন্দ্বকে সামনে রেখেই দাওয়াহ পেশ করেছেন, কর্মপদ্ধতি সাজিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যেই নীতি ঠিক করে দিয়েছেন, ভালো-খারাপের মানদণ্ড ঠিক করে দিয়েছেন, সেটিকে যখনই কেউ চ্যালেঞ্জ করেছে তখনই ঈমান বনাম কুফর, ইসলাম বনাম জাহিলিয়্যাতের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে হাজির হয়েছে।

আল্লাহর আইন কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তা ১৪০০ বছর আগের হোক কিংবা ১৪ হাজার বছর আগের হোক। আল্লাহর আইন চিরকালের জন্য ধ্রুব সত্য। আমাদের কোনো ইচ্ছাধিকার নেই তাতে পরিবর্তন করার, পরিমার্জন করার। সেই আলোকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় প্রধান দ্বন্দ্ব হলো ইসলাম বনাম আধুনিকতার দ্বন্দ্ব। আধুনিকতা নতুন নতুন বেশ কিছু চিন্তাধারা হাজির করেছে। যেমন, হিউম্যানিজম, লিবারেলিজম, সেক্যুলারিজম, জাতীয়তাবাদ। এই চিন্তাধারার আলোকে আরো বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক চিন্তাধারাও হাজির হয়েছে। যেমন, গণতন্ত্র, নারীবাদ, বিজ্ঞানবাদ, প্রাচ্যবাদ ইত্যাদি।

ইসলাম বনাম আধুনিকতার দ্বন্দ্ব হলো আল্লাহর আইন বনাম গাইরুল্লাহর আইনের দ্বন্দ্ব। আল্লাহ একটি মানদন্ড নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আধুনিকতা আরেকটি মানদন্ড নির্ধারণ করে।

আল্লাহর আইনকে চ্যালেঞ্জ করে টিকে আছে এই আধুনিকতার সকল চিন্তাধারা। এগুলো তুরুপের তাসের মতো। ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। কিন্তু ফুঁ দেওয়াটা ফুঁ দেওয়ার মতো দিতে হবে।

তাই সমাজে আমাদের প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে আমাদের প্রধান সংকটগুলো। সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক অবক্ষয় হলো মূল সমস্যাগুলোরই উপসর্গ। তাই মূল সমস্যাগুলো নিয়ে কথা না বলে যতই আমরা উপসর্গ নিয়ে কথা বলি, রোগ থেকে কখনোই চিরতরে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

এটা নিছক কোনো মতাদর্শিক বিরোধ নয়। রাজনৈতিক বিতর্ক নয়। এটি বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব, দ্বীনের দ্বন্দ্ব। এখান থেকেই প্রশ্ন আসে মানব অস্তিত্বের মৌলিক বিষয়ে।

আমি কে?
আমি কেন পৃথিবীতে এসেছি?
আমাকে কোথায় যেতে হবে?
মানবজীবনের উদ্দেশ্য কী?
ভালো কী?
মন্দ কী?
ভালো-মন্দের মাপকাঠি কোথা থেকে আসে?
বিধান কে দেবে?
আইনের ভিত্তি কী হবে?
সমাজের রীতিনীতি আর শাসনব্যবস্থার উৎস কী হবে?
সার্বভৌমত্ব কার? কর্তৃত্ব কার?

প্রত্যেক সমাজ ও সভ্যতাকে এই প্রশ্নগুলোর মীমাংসা খুঁজে বের করতে হয়। নির্ধারণ করতে হয় মাপকাঠিসমূহ। এখানেই ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। আধুনিকতা, পশ্চিমা সভ্যতা হলো মানবকেন্দ্রিক। মানুষের বিবেককে এখানে মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ

সেক্যুলারিজমের ধর্মীয় স্বাধীনতা

সেক্যুলার বা সেক্যুলারিজমের খাঁটি বাংলা অর্থ কি, তা অনেক সরলমনা মুসলমানরা না জেনেই সেক্যুলারিজমকে ভালো মনে করে থাকেন। খাঁটি বাংলায় বলতে গেলে সেক্যুলারিজম মানে ধর্মহীনতা। এটাকে অনেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদও বলে। যদিও এটি সঠিক কথা নয়। মূলকথা হলো রাষ্ট্রীয় কাজের সাথে ধর্মকে সম্পৃক্ত না করা। ধর্মকে শুধুমাত্র কিছু রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থানে সীমাবদ্ধ রেখে দৈনন্দিন জীবন থেকে ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া মনগড়া নীতিকেই সেক্যুলারিজম বলা হয়।

রাষ্ট্রের এই চাপিয়ে দেওয়া নীতি বা সংবিধানকে বলা হয় সার্বভৌমত্ব সংবিধান। এটির ভুল ধরা যাবে না। সংবিধানের কোনো নীতি পরিবর্তন করতে হলে সংসদে রীতিমতো তর্কযুদ্ধ করে তা পরিবর্তন করা যাবে। কিন্তু এর মধ্যে আবার মূলনীতি কখনোই পরিবর্তন করা যাবে না। এমনটাই হলো, সেক্যুলারিজম বা সেক্যুলারের অর্থ। এবার একটু আলোকপাত করি, এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আমাদেরকে কতটা ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়!

রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলে, সেক্যুলারিজম সকল ধর্মকে সমান চোখে দেখে। তারা ধর্ম যার যার উৎসব সবার বলে স্লোগান তোলে। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো শুধুমাত্র ধোঁকা ও চোখের ভ্রম। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যেহেতু বলে, "সকল ধর্ম সমান। সকলের নিজ নিজ স্থানে ধর্ম পালনের অধিকার আছে" – এই স্লোগানের রেশ ধরেই একটা ভেজাল লেগেছিল আমেরিকাতে।

শয়তানের পূজারিদের ব্যাফোমেট নামক একটি মূর্তি আছে। যেটির আকৃতি হলো, মাথা ছাগলের কিন্তু শরীর মানুষের মতো। মাথায় আছে

ইসলামী গণতন্ত্রের স্বরূপ সন্ধানে

উপনিবেশ শাসনামলের পরবর্তী সময়ে যখন দখলদাররা মুসলিম ভূমি থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করল তখন একটি সমস্যা প্রকট আকারে দেখা দিলো। ইউরোপিয়ানরা চাচ্ছিল, তাদেরই অনুগত ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা বুঝিয়ে দিতে দেশত্যাগ করতে। তারা সর্বদাই কিছু ব্যক্তিদের স্কলারশিপ দিয়ে ইউরোপ থেকে লেখাপড়া করিয়েছিল। এই 'জাতে দেশি, চিন্তায় বিদেশি' ব্যক্তিদের হাত ধরেই মুসলিমবিশ্বে সেক্যুলারিজমের উত্থান ছড়িয়ে পড়ে।

পশ্চিমারা তখন ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের আদলে নির্বাচনের প্রস্তাব দিল। যারা জয়ী হবে, তাদের হাতে ক্ষমতা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। মুসলিমবিশ্বের উলামায়ে কেরামগণ বহু আগেই পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার কুফলসমূহ ধরতে পেরেছিলেন। তাই উলামায়ে কেরামগণ কোনোমতেই গণতান্ত্রিক পন্থায় আগ্রহী হলেন না। তারা এর শক্ত বিরোধিতা করলেন।

কিন্তু একটা সময় দেখা গেল, কোনো কোনো আলিম সরকারে যাওয়ার অন্য কোনো প্রক্রিয়া সিস্টেমের মধ্যে না পেয়ে এই গণতন্ত্রকে বিভিন্ন কঠিন শর্তের ভিত্তিতে গ্রহণ করলেন। তাদের নিকট গণতন্ত্র মূল উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তারা গণতন্ত্রকে গ্রহণ করলেন পার্লামেন্টে যাওয়ার প্রক্রিয়া হিসেবে। যাতে পার্লামেন্টে গিয়ে ইসলাম কায়েম করতে পারেন।

আস্তে আস্তে এই চিন্তা গ্রহণ করে নিল মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী দলসমূহ। যেমন মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিন, জর্ডানের ইসলামিক অ্যাকশন ফ্রন্ট, ইয়েমেনের আল-ইসলাহ পার্টি, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ,

উম্মাহর সন্ধিক্ষণ

ঘুমন্ত উম্মাহ ও জাগ্রত শত্রু

পৃথিবীর বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়। মানব রচিত আইনগুলো কখনোই আজীবন একই সিস্টেমে চলে না। তাদের আপডেট করা লাগে, কৃত্তিমতা যুক্ত করা লাগে, আরো অনেক ছলছাতুরির আশ্রয় নেওয়া লাগে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে খিলাফাহ ধ্বংস করে দেওয়া হলেও কুফফার শক্তির ইচ্ছা শুধু খিলাফাহ ধ্বংস নয়, বরং কাফেররা চায় আরো কিছু, আরো বহু কিছু। তারা চায়, মুসলমানরা নিঃশেষ হয়ে যাক। মুসলমানরা পৃথিবী থেকে বিতাড়িত হয়ে যাক। মুসলমানরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাক।

কাফেরদের এই চাওয়া-পাওয়া এত সহজে পূরণ হবে না। কারণ, প্রকৃত একজন মুসলিম কখনোই কাফেরদের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে না। মুসলমানরা চায়, মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলিম সরকার। শরীয়াহ শাসনব্যবস্থা। এখন এই রাষ্ট্র, সরকার, শাসনব্যবস্থা কি বাস্তবিক হবে নাকি পোশাকি হবে, সেটা নিয়ে সাধারণ মুসলমানরা তেমন একটা ভাবে না। সাধারণ মুসলমানরা সাইনবোর্ড দেখলেই খুশী, ভেতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা নিয়ে ভাবার সময় তাদের নাই। তাদের এই অজ্ঞতার সুযোগটাই নেয় কাফেররা।

মুসলমানদের বড় শত্রু কারা?

পৃথিবীতে দুইটি জাতি মুহাম্মাদ ﷺ এর সময় থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ষড়যন্ত্র করে আসছে। মুশরিক এবং ইহুদিরা। সাধারণত ইহুদি-খ্রিষ্টানরা যদিও পরস্পর কাছাকাছি মুসলমানদের বিরুদ্ধে। কিন্তু মুশরিকরা খ্রিষ্টানদের চেয়েও এক ধাপ অগ্রসর। তাই তো যখন মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল তখন তাদের পরামর্শদাতা ছিল মদীনার ইহুদিরা। বিপরীতে যখন মদীনার ইহুদিরা যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল তখন তাদের পাশে এসে দাঁড়াল মক্কার মুশরিকরা।

বর্তমান সময়ের দিকে লক্ষ্য করুন। গাজ্জায় গণহত্যা চালাচ্ছে পাপিষ্ঠ ইহুদিরা। কিন্তু এই জেনোসাইডে উল্লাস প্রকাশ করছে ভারতের মুশরিকরা। তারা বিবৃতি জারি করছে, ভিডিও প্রকাশ করছে ইহুদিদের পক্ষে। ক্ষেত্রবিশেষে তারা ডেভিড স্টার, নেতানিয়াহু, ট্রাম্প, বাইডেনের পূজা করছে।

মন্তব্য করে বলছে, আমাদের কিছুই দেওয়া লাগবে না। আমরা শুধু গাজ্জায় গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। তুফানুল আকসা যুদ্ধের পর থেকে অনেক ভারতীয় ইসরাইলের পক্ষ হয়ে গাজ্জায় যোদ্ধা, সুইপার, জায়োনিস্টদের সহকারী হিসেবে গিয়েছে। এগুলো ওপেন সিক্রেট। আমেরিকার সরকার যতটা না ইসরাইলের পক্ষে থেকে খুশী হয় তার চেয়েও হাজার গুণ বেশি খুশী হয় এই মুশরিকরা। অথচ ইহুদি আর মুশরিকদের আকিদা পুরো ৯০ ডিগ্রি উলটো। ইহুদিরা গরু খায়। কিন্তু ভারতীয় মুশরিকরা গরুকে মা মনে করে। ইহুদিরা মূর্তিপূজা ঘৃণা করে। কিন্তু মুশরিকরা মূর্তিপূজক। এখানের আসল কথা হলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার সমস্ত

ছাত্রদের সাথে সংহতি জানিয়ে রাস্তায় নামলো সাধারণ মানুষ। দেশের মাটি রক্তে রঞ্জিত হলো। ৯০০+ শিক্ষার্থীসহ, কুলি, দিনমজুর, শ্রমিক, শিশু, নারী-পুরুষ মারা গেল এই কয়েকদিনের গণহত্যায়। আহত হলো ২০০০+ এরও বেশি। গণগ্রেপ্তার হলো হাজার হাজার মানুষ। "সামনের ফাল্গুনে আমরা দিগুণ হবো" – স্লোগানে ভরে উঠলো সোস্যাল মিডিয়া।

দেশের ভবিষ্যত কি? দেশের এই স্বৈরাচারের পতনই কি একমাত্র সমাধান? আমরা কি পুরো মুক্তো-স্বাধীন দীপ্ত বাঙালী হয়ে যাবো? এক কথায় উত্তর হলো, না। এই ভূখন্ডে আমরা কিভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো, এটা বুঝার জন্য আমাদের মানচিত্রে আগে চোখ বুলাতে হবে। বাংলাদেশের অবস্থান ভৌগলিকভাবে কোথায় দেখুন। আমাদের আশেপাশে কোনো মুসলিম দেশ নেই।

বাংলাদেশে দ্রোহের ব্যর্থতা

দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট এই ভূমিকে যতটা সহজ মনে হয়, এর ভৌগলিক ও রাজনৈতিক সিস্টেম ততটাই কঠিন। মুসলিম ভূখন্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এই ভূমি ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর পাকিস্তানের অধীনে থাকলেও রাজনৈতিক কারণে আলাদা হয়ে যায়। স্বাধীন এই ভূখন্ডে স্বাধীনতার শুরু থেকেই এক এক করে হাজারো সমস্যা হাজির হয়। ভারতের ক্রমাগত হস্তক্ষেপ ছিল পাকিস্তান আমল থেকেই। তাদের জন্য দুইপাশে দুইটা মুসলিম ভূখন্ড ছিল গলার কাঁটার মতো।

দেশ আলাদা হলো। আলাদা পতাকা হলো। কিন্তু এরপর.......? রাজনৈতিক নেতাদের ভুল পদক্ষেপ এবং স্বৈচ্ছাচারিতা দেশের মানুষকে ঠেলে দিল দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বরে। আওয়ামী দুঃশাসনের পুরো চিত্রটা অনেক জটিল। স্বাধীনতার পর থেকেই তারা ছিল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শত্রু এবং সংখ্যালঘিষ্ট মানুষের বন্ধু। এই বামধারার রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র ভারত। কারণ, ভারতের পার্শ্ববর্তী এই ভূখন্ডে দরকার শক্তিশালী একটি মিত্র। যারা কুকুরের মতো কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। ৫ আগষ্ট বা ৩৬ জুলাই ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে যুগান্তকারী অধ্যায়। ফ্যাসিবাদের পতনের জন্য দেশের সর্বাত্রক মানুষ আন্দোলন করে আওয়ামী রেজিমকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু এরপর কি ঘটলো? অন্তবর্তীকালীন সরকারে আওয়ামী লিবারেলপন্থীরা জায়গা করে নিল। এনজিওরা পরিষদের অন্তর্ভূক্ত হলো। শব্দখেলা শুরু হলো। ইন্ডিয়াকে একদিকে চাপ দিয়ে আরেকদিকে ছাড় দেওয়া শুরু হলো। বিপ্লব বেহাত হওয়ার ঘটনা শোনা যাচ্ছে অনেক। বিশেষ করে জুলাই বিপ্লবে আহতদের

চীনের জিনজিয়াংয়ের কাজাখ পরিবারগুলোর দুঃখ

পূর্ব তুর্কিস্তান। বর্তমান নাম জিনজিয়াং। এক উন্মুক্ত কারাগার। এক রক্তক্ষয়ী বর্তমান। স্বাধীন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ভূমি হলো চীনের এই অঞ্চল। ২০২১ সালের শুরুর দিকে মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলে উইঘুর মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবতাবিরোধী কার্যক্রমের নতুন প্রমাণ তুলে ধরে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

প্রতিবেদনগুলোতে ২০১৭ সাল থেকে চীনের বন্দী শিবিরের ছদ্মবেশে প্রতিষ্ঠিত রি-এডুকেশন সেন্টারের চিত্র তুলে ধরা হয়। চীন জাতিগত উইঘুর, কাজাখ, হুই, কিরগিজ, উজবেক এবং তাজিক জাতিগোষ্ঠীদের নজরদারির আওতায় এনে তাদেরকে সন্দেহের বশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে যখন ইচ্ছা তখন। চীনে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো নিষিদ্ধ থাকায় সেখানের কোনো খবর বাহিরের পৃথিবী প্রায় জানেই না বললেই চলে।

যদি কেউ হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম, ফেসবুক কিংবা অন্য কোনো অ্যাপ ধারা চীনের বাহিরে যোগাযোগ করে তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। সার্বক্ষণিক নজরদারির আওতায় রাখতে চীন সরকার প্রত্যেক উইঘুর ও অন্যান্য নাগরিকদের মোবাইলে বাধ্যতামূলক নজরদারি অ্যাপ ইন্সটল করিয়ে রেখেছে। আজকের গল্পের সবগুলোই কাজাখ জাতির সাথে সম্পৃক্ত। কাজাখস্তান ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীন হওয়ার পর বিদেশে বসবাসকারী কাজাখদের দেশে ফিরে আসতে উৎসাহিত করা হয়।

ফিলিস্তিন যেভাবে স্বাধীন হবে

গাজ্জায় যখন একটি শিশু আহত হয় তখন যেন আমারই আপন ভাই আহত হচ্ছে। যখন একজন পিতা শহীদ হচ্ছে তখন যেন আমারই পিতার লাশ আমি দেখছি। যখন পশ্চিম তীরে একজন যুবককে আটক করা হয় তখন যেন আমারই আত্মীয়কে আটক করা হচ্ছে। যখন একজন মা নিজের সতীত্ব হারান তখন যেন.....। নাহ্ আর ভাবতে পারছি না। অথচ ফিলিস্তিনে প্রতিদিন আহত, নিহতদের পরিসংখ্যা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। কারাগারে বন্দিদের সংখ্যা বেড়েই চলছে।

ফিলিস্তিন। মুসলিম বিশ্বের ছোট্ট ভূখণ্ডগুলোর একটি। ত্যাগের দিক থেকে তারা সমস্ত মুসলমানদের সর্বাগ্রে রয়েছে। এমন কোনো ত্যাগ নেই, যা তারা দিচ্ছে না। গৃহহীন হওয়া থেকে শুরু করে পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ, শিশুর সামনে বাবার লাশ, বোনের হাতে ভাইয়ের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ, পৃথিবীর সবেচেয়ে নির্মম দৃশ্যের অবতারণা ঘটছে এই ভূমিতে।

ফিলিস্তিনের চলমান সংঘাত কোনো ভূমিকেন্দ্রিক বা জাতি কেন্দ্রিক ইস্যু নয়, এটি হলো ধর্মীয় ইস্যু। ঈমান বনাম কুফরের লড়াই। এই লড়াইয়ে ধর্মীয় আবেগ-উদ্দীপনাই হলো একমাত্র অস্ত্র। শত্রুরাও এই ধর্মকেই পুঁজি করে অগ্রসর হচ্ছে।

ইহুদি-খ্রিষ্টানরা ধর্মের আড়ালেই এই ভূখণ্ডকে দখল করেছিল। এই ভূমিতে কোনো সংলাপ, চুক্তির মাধ্যমে কুফফারদের মোকাবেলায় টিকে থাকা কখনোই সম্ভব নয়। যদিও বাস্তবিকভাবে শত্রুরা ধর্মের আড়ালে পুঁজিবাদ ও সেক্যুলারিজমকে গ্রহণ করে। কিন্তু সেটা এখানে মুখ্য বিষয় নয়।

ফিতনার মুখোমুখি উম্মাহ

ট্রান্সজেন্ডার কি?

ট্রান্সজেন্ডার বলা হয়, রুপান্তরকামীকে। অর্থাৎ মানুষের জন্মগত জেন্ডার (পুরুষ বা মহিলা) পরিচয়কে বাদ দিয়ে নিজের মতো জেন্ডার নির্ধারণ করা। একজন ব্যক্তি জন্মগতভাবে হয় পুরুষ হবে অথবা মহিলা হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম তথা হিজড়াও দেখা যায়। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার আর হিজড়া কখনোই এক জিনিষ নয়।

হিজড়া হলো একটি জন্মগত জেনেটিক সমস্যা। হিজড়া কিভাবে হয়? এমন প্রশ্নের জবাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে, জন্মের সময় অ্যান্ড্রোজেন রিসিপ্টর নামক একটি জিনে পরিবর্তনের কারণে পুরুষদের হরমোন তৈরিতে বাধাগ্রস্ত হয়। যে কারণে তারা জেনেটিক্যালি তথা জন্মগতভাবে পুরুষ হয়েও বাহ্যিকভাবে দেখা যায় মেয়েদের মতো। প্রতি ৫ হাজার শিশুর মধ্যে ১ জন এমন হতে পারে। এছাড়াও আরো বেশ কিছু কারণে হিজড়া হতে পারে। কিছু ধরন আছে যেগুলো বয়ঃসন্ধির আগে বুঝা যায় না।

হিজড়া খুবই অস্বাভাবিক একটি ঘটনা। শিশুজন্মের মাত্র ০.০১৮% ক্ষেত্রে হিজড়া নামক সমস্যা দেখা দিতে পারে। বাকী ৯৯.৯৮% ক্ষেত্রে শিশুরা জন্মগতভাবে ছেলে বা মেয়ে হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডারকে কোনো অসুস্থতা বা মানসিক সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয় না। ট্রান্সজেন্ডারের বাংলা হিসেবে অনেকে হিজড়া শব্দ ব্যবহার করে থাকে। এটি মারাত্মক ভুল। শব্দের মারপ্যাচে ফেলে মানুষকে

বাংলাদেশে সমকামিতা মতাদর্শ বিস্তার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পৃথিবীতে আস্তে আস্তে নতুন নতুন কিছু ফিতনা আমদানি শুরু হয়। যেসব ফিতনা প্রাচীনকালে পৃথিবীতে থাকাবস্থায় স্রষ্টার পক্ষ হতে ধ্বংস নেমে এসেছিল। তারপরও এসব ফিতনা ছড়ানো শুরু হলে এর সাথে সাথে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু, ভাইরাসও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

৯০ দশকের সময়ে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা এবং রোল মডেল দেশগুলো এইডস রোগকে পৃথিবীর জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে। এইডস ভাইরাস নির্মূলের লক্ষ্যে তৈরি হয় নিত্য নতুন ঔষধ, টিকা ও বহু গবেষণাকেন্দ্র। এইডস ভাইরাস মোকাবেলার জন্য সেই সময় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগ করে, ফান্ড দেয়।

এইডস মহামারি পৃথিবীতে এসেছে বিকৃত যৌনাচার ও সমকামিতা মতাদর্শ শুরু হওয়ার পর থেকেই। সেই সময় এইডস নিয়ে যেসব সংস্থা কাজ করতো, দেখা যেত, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারাও সমকামী অথবা সমকামী সংগঠনের সাথে জড়িত। ফলস্বরূপ এইডস নির্মূলের জন্য দেওয়া ফান্ড চলে যায় সমকামীদের হাতে। আর সমকামী ব্যক্তিরা এই সমকামিতাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে নামে। তৎকালীন সময় পৃথিবীতে বহু জায়গায় সমকামিতা নিষিদ্ধ হলেও তারাও এইডস রোগ নির্মূলের জন্য ফান্ড দিত। তাই সমকামিরা এভাবেই বহু দেশ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেয়।

আস্তে আস্তে এই ধারা বাংলাদেশেও প্রবেশ করে। বাংলাদেশে সমকামিতার বিস্তার ঘটে শিবানন্দ খান ও 'বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার' এর হাত ধরে। তবে এর আগে আরো বেশ কিছু এনজিও এই লক্ষ্যে

বাংলাদেশে কাজ করে। উপমহাদেশে ‘নায ফাউন্ডেশন’ সমকামিতা বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করা শুরু করে শিবানন্দ খান এর হাত ধরে। এটি ভারতসহ বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে সমকামিতা প্রচারের লক্ষ্যে মিশন শুরু করে। এভাবেই একটি বৃহত্তম নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। শিবানন্দের সহায়তায় বাংলাদেশে সমকামী পুরুষদের যৌন স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৬ সালে ‘বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার’ নামক প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে।

সমকামিতা বিস্তারে ‘বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার’

‘বন্ধু’কে তখন সহায়তা করেছিল শিবানন্দের নায ফাউন্ডেশন। এছাড়াও আমরিকান একটি এনজিও ‘ফ্যামিলি হেলথ ইন্টারন্যাশনাল’ ও ‘বন্ধু’কে সাহায্য করে। আর ‘বন্ধু’ জানায় ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে শিবানন্দ খান যেই জঘন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এসেছিল, এতে সহায়তা দেয় আমেরিকার ‘ফোর্ড ফাউন্ডেশন’। বাংলাদেশেও সেই সময় এই সমকামীদের মাধ্যমে এইডস রোগ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। যেহেতু ‘বন্ধু’ এইডস রোগ নির্মূলের সাইনবোর্ড লাগিয়ে এই সেক্টরে কাজ করছিল, তাই তারা বাংলাদেশ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করার সুযোগ পায়।

পরবর্তীতে ‘বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার’ USAID, নেদারল্যান্ড দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ থেকে তাদের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য ফান্ড পায়। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের কার্যক্রম সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। ‘বন্ধু’ তখন সমকামী পুরুষদের জন্য ডিএইসি নামে স্টপ ক্লিনিক খোলে। তারা তখন সমকামী পুরুষদের নিকট বিভিন্ন যৌন টুলস বিতরণ করে। পাশাপাশি সমকামীরা যেন সহজেই যৌন সঙ্গী খুঁজে পায়, তাই একটি নেটওয়ার্কও তৈরি করে তারা।

অর্থাৎ তারা ছদ্মবেশে চিকিৎসা সেবার নামে সমাজে বিকৃত ও নিষিদ্ধ যৌনাচার বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করা শুরু করে। পরবর্তীতে ২০০০ সাল

সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্ধকার দিক

আসিফা বানু থেকে মৌমিতা

পশ্চিম বাংলার একটি ঘটনা পুরো এশিয়ার ভীত নাড়িয়ে দিয়েছে।[37] সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, অরাজগতা যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন এমনটা যে ঘটবে, তা প্রত্যাশিত। মৌমিতা নামক একটি মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। ধর্ষণের আগে তাকে হত্যা করা হয়েছে। মাথা থেতলে দেওয়া হয়েছে। এমনটাই করেছে দুর্নীতিবাজ ভারতের উগ্র হিন্দুরা। আজ মৌমিতার ঘটনায় পুরো পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল। বাংলাদেশের সোসাল মিডিয়াতে এটি নিয়ে আলোচনা চলছে। প্রশ্ন উঠছে, নারীর নিরাপত্তা কোথায়? এই প্রশ্নটির আমরা একটু পোস্টমর্টেম করে পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ এশিয়ার এই দেশগুলোতে নারীবাদী সংগঠনের অভাব নেই। বৃটিশ ল' মান্য করা এবং বৃটিশদের গোলামী করে নিজেরা স্বাধীন হওয়ার পরও কখনো তারা নিজ বুদ্ধিতে কিছুই করতে পারে নি। ইংরেজরা তাদেরকে যেই আইন দিয়ে গিয়েছিল, সেই আইনেই তারা চলছে। হিন্দু অধ্যুষিত ভারত নিয়ে আমার কোনো কথা নেই। কারণ, হিন্দুধর্ম হলো কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। অথচ পাকিস্তান-বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান। শুরুতে এই দেশদ্বয়

৩৭ প্রবন্ধটি ১৭ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে লেখা হয়।

প্রোপাগান্ডা, মানুষের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ, ব্রেইন মেশিন ইন্টারফেস, এআই এবং মানব মস্তিষ্কের একত্রিতকরণ হবে গুরুত্বপূর্ণ।

এ ছাড়াও ন্যানো টেকনোলজি, অটোমেটেড সেনাবাহিনী, মহাকাশভিত্তিক যুদ্ধ আরও ভয়ংকর রূপ ধারণ করবে। এই টেকনোলজিগুলো আরও উন্নত হবে। ফলে আরও নিত্য নতুন অস্ত্র এই ফিল্ডে আসবে। অষ্টম প্রজন্মে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে ন্যানো বট, মাইক্রো-ড্রোনস, অটোমেটেড ট্যাংক ও ড্রোন, অটোমেটেড সেনাবাহিনী, স্পেস-ভিত্তিক মিসাইল, স্পেস-ভিত্তিক স্যাটেলাইট মিসাইল, বায়ো-লজিক্যাল অস্ত্র, উন্নত সাইবার আক্রমণ ইত্যাদি। এর সময়কাল: ২২১০ থেকে ২৩০০ (অথবা আরও পরে, ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল)।

শেষ কথা

যুদ্ধনীতির ক্রমবিকাশ নিয়ে এভাবে চাইলে আরও কল্পনা করা যায়। আরও চিন্তা করা যায় বাস্তবতার আলোকে। তবে এর সবগুলোই হাইপোথিসিস। ৯ম এবং ১০ম প্রজন্মের যুদ্ধে পুরো পৃথিবীকে একত্রিত করা হবে বলে ধারণা করা হয়। মানে New World Order বাস্তবায়ন। তখন পুরো পৃথিবীর তথ্য একটা সেন্ট্রাল কমান্ডের অধীনে আনা হবে বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানে আমরা চতুর্থ বা পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধে আছি। এটা গেরিলা যুদ্ধ, প্রোপাগান্ডা, মিডিয়া যুদ্ধ, ন্যারেটিভ তৈরির উপর নির্ভরশীল। এ ছাড়াও বাস্তবতার আলোকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত তো আছেই।

সর্বশেষ আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ উত্তম পরিকল্পনাকারী। তিনি অতীত এবং ভবিষ্যতের সকল সংবাদ জানেন। কুরআনের সেই আয়াতটি চিরসত্য। আল্লাহ তাতে বলেছেন, “কত ক্ষুদ্র দল কত বড়ো দলকে পরাজিত করে দিয়েছে”। বিজ্ঞান যতই নিজেকে উন্নতি করুক না কেন, তারা আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমারেখার বাহিরে যেতে পারবে

আল ইয়াসিন ১০৫ মর্টার শেলের পেছনের গল্প

দখলদার জায়োনিস্ট এবং ফিলিস্তিনি মুজাহিদ ও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যকার সংঘাতের সময় ইহুদিরা এবং তাদের সমর্থকরা বিশ্বে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বুলি ছড়ানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করে। জায়নবাদী ইহুদি ও ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য হলো, জায়োনিস্টরা সামরিক শক্তিতে অত্যন্ত শক্তিশালী। তাদের নিকট আছে উন্নত অস্ত্র, আর্থিক সহায়তা এবং মোড়ল রাষ্ট্রগুলোর প্রতক্ষ সমর্থন। ফিলিস্তিনিদের যদিও এতটা শক্তি ও মোড়ল রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন ছিল না, কিন্তু সততা, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ় সংকল্প বিদ্যমান ছিল।

তাই ফিলিস্তিনিরা যুগের পর যুগ লড়াই চালিয়ে গিয়েছে। ময়দানে তারা পিছপা হয় নি। ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা যুদ্ধে জায়োনিস্টদের সমস্ত ফ্রন্টে এবং শত্রুদের অত্যাধুনিক যানবাহনের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু শত্রুরা ফিলিস্তিনিদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে নি। উল্টো ফিলিস্তিনি মুসলমানদের আক্রমণে শত্রুরা দিশেহারা ও পর্যদুস্ত হয়েছে। ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে যখন দ্বিতীয় ইন্তিফাদার ডাক দেওয়া হয় তখন ইহুদিবাদীদের ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া যানবাহনগুলো ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও গাজ্জা উপত্যকার দিকে দলে দলে অগ্রসর হয়।

সেই সময় ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিকট হালকা কিছু রাইফেল ছিল। যা দ্বারা এত বড় ট্যাঙ্কের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। তারপরও ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা হাল ছাড়েন নি। তারা ভিন্নভাবে এই দানব ট্যাঙ্কগুলোর মোকাবেলার জন্য তৈরি হয়। চেষ্টা ছিল বড় বিস্ফোরক যন্ত্রের মাধ্যমে শত্রুদের গাড়িতে আক্রমণ করা। এই প্রচেষ্টাটি সফল হয়েছিল প্রায়। কিন্তু এই বিস্ফোরক ডিভাইসগুলোর আকার-আকৃতি,

শাহবাগী বনাম শাহবাগ বিরোধী সেক্যুলার

২০১৩ সালে যখন শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চে আন্দোলন শুরু হলো, এরপর থেকেই সেক্যুলার সমাজের কেউ কেউ এটির বিরোধিতা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার কর্মী, দৈনিক পত্রিকা ও সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকও এই আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু করে। কিন্তু কেন?

শাহবাগী বামপন্থিদের মূল টার্গেট ছিল সংস্কৃতির উপর। তাই প্রথমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে তারা আন্দোলন শুরু করে। ক্রমে ক্রমেই এটি ইসলামবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। এই সময়টাতে বাংলা ব্লগের যুগ ছিল ইন্টারনেট জগতে। বিভিন্ন ব্লগ ও ফেসবুকে ইসলামবিরোধী কথাবার্তা, আল্লাহ ও তার রাসূলকে গালি দেওয়া ছিল শাহবাগী নাস্তিকদের প্রতিদিনকার রুটিন। পরবর্তী সময়ে যখন একজন নাস্তিককে কিছু ইসলামপ্রিয় ভাই জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয় তখন থেকে শাহবাগীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিমরা জেগে উঠে।

শাহবাগ বিরোধী সেক্যুলাররা শাহবাগীদের পক্ষ ত্যাগ করেছিল আদর্শিক কারণে। সেক্যুলারিজমকে কয়েকটি ভাগে রাখা যায়। প্রথমটি হলো কট্টরপন্থি সেক্যুলার। তাদেরকে আরেকভাবে বলা যায় নাস্তিক্যবাদী সেক্যুলার। এরাই শাহবাগ আন্দোলনে নেতৃত্বে ছিল। ইসলামবিরোধী লেখালেখি, স্লোগানে তারা শাহবাগকে মুখিয়ে রেখেছিল পুরোটা সময়। দ্বিতীয়টি হলো উদারপন্থি সেক্যুলার। এরা যদিও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মকে আনতে নারাজ, কিন্তু কেউ ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করলে সে চুপ থাকে না। সে তখন ধর্মীয় সহানুভূতি থেকে ইসলামের পক্ষে থাকতে বাধ্য হয়। নাস্তিকদের বিরুদ্ধে তাদের সংঘাত শুরু হয়। তবে এখানে লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশে শাহবাগ বিরোধী

আমার নয়। এটা অন্য কারও। আমি এসব খারাপ কাজ কখনোই করিনি। আল্লাহ তার মুখের জবান বন্ধ করে দেবেন। তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জবান খুলে দেবেন। শরীরের সমস্ত অঙ্গ তখন তার বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য দেবে। এরপর ফেরেশতারা তাকে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে।

সেদিনের সেই প্রেক্ষাপটে সেও আফসোসের সাথে কড় জোরে বলতে থাকবে, হে আমার রব! আমাদের আরেকবার দুনিয়াতে প্রেরণ করুন। আমি সবচেয়ে ভালো ব্যক্তিটি হয়ে আপনার সামনে হাজির হব। আল্লাহ বলবেন, কখনোই না। তুমি ভোগ করো জাহান্নামের আজাব। যেটাকে তোমরা দুনিয়াতে মিথ্যা মনে করতে। যেটা নিয়ে হাসাহাসি করতে।[৪৪]

সমাপ্ত

[৪৪] ভাবার্থ এটি। সূরা আনআম, আয়াত ২৭। সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৮। সূরা নাবা, আয়াত ৩০।